Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 7, July - 2026

DOIs:10.2018/SS/202607019 --:-- Research Paper / Article / Review

পরিবেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-সাহিত্য

CHANDRANI ROY
Ph.D, Research Scholar
Dept. Of Bengali , Banaras Hindu University
Email Address: Croy25682977@Gmail.Com

Abstract: কোনো বিপ্লবই হঠাৎ করে একদিনে সৃষ্টি হয় না। তার পেছনে থাকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। ইতিহাসের পাতায় যেসব বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটে গেছে, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলোকে আকস্মিক বা ক্ষণিকের বিস্ফোরণ মনে হতে পারে। কিন্তু একটি সফল বা সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং একদল চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের অক্লান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা। শৃঙ্খলিত জনমানুষের মনকে প্রথমে শৃঙ্খলমুক্ত করার কাজটি করেন দার্শনিকরা; সাহিত্যিকরা আর সেই মুক্ত মন যখন বাস্তব জীবনে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়, তখনই জন্ম নেয় রাজনৈতিক আন্দোলন। তেমনই রবীন্দ্রনাথের লেখায় রয়েছে পরবর্তীকালের পরিবেশ আন্দোলনের বীজ। আমরা এই গবেষণাটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য ও কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্পের নিরিখে আলোচনা করে দেখব প্রকৃতি ভাবনা ও পরবর্তী পরিবেশ আন্দোলনের চেতনা কিভাবে প্রোথিত হয়েছে তা আলোচনা করে দেখব।

Key words: রবীন্দ্রনাথ, পরিবেশ আন্দোলন, বিষ্ণোই আন্দোলন, বলাই, নিয়মগিরি আন্দোলন, রক্তকরবী, নর্মদা আন্দোলন, মুক্তধারা।

1. Introduction: উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প-কারখানার ধোঁয়া ও বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে নাগরিকরা সোচ্চার হন। ১৮৫০-এর দশকে লন্ডনের টেমস নদীর ভয়াবহ দূষণ (Great Stink) এবং কয়লার ধোঁয়ায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর পর নাগরিক সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬৩ সালে ঐতিহাসিক আলকালাই অ্যাক্ট (Alkali Act) পাসের মাধ্যমে প্রথম আধুনিক পরিবেশ আইন চালু হয়। ১৮৬৪ সালে জর্জ পারকিন্স মার্শ তাঁর বিখ্যাত 'ম্যান অ্যান্ড নেচার' (Man and Nature) বইটি প্রকাশ করেন, যা আমেরিকার পরিবেশ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। ক্রমে সময় যত এগিয়েছে এই আন্দোলন নানা রূপে আমাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে। ভারতবর্ষে বিষ্ণোই আন্দোলন বা চিপকো আন্দোলনের মতো এই সব পরিবেশবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগেই চিন্তাশীল মানুষেরা ভেবেছেন মানুষ ও প্রকৃতি-পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে। ভারতবর্ষের এমন একজন সাহিত্যিক তথা দার্শনিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ যিনি তাঁর রচনায় মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলেছিলেন।

2.Literature Review: 'প্রতিভাস' ওয়েবজিনে প্রকাশিত **'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পরিবেশচেতনা'** শিরোনামে মহাদেব মণ্ডলের লেখা প্রবন্ধ, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' সাহিত্য পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশে (অনলাইন) ঈপ্সিতা চক্রবর্তীর লেখা **'রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা'** শীর্ষক মৌলিক প্রবন্ধ, 'জাগোনিউজ ২৪' অনলাইন সংবাদপত্রের 'সাহিত্য' শীর্ষক কলামে সাইফুর রহমান তুহিনের লেখা **'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা'**র মতন মৌলিক প্রবন্ধগুলো রবীন্দ্র-সাহিত্যে পরিবেশ চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করেছে। এছাড়া লালমাটি থেকে প্রকাশিত প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত **'গল্পসমগ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'** গ্রন্থে নির্বাচিত গল্প পাঠ এবং পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশিত ড·রবীন্দ্রনাথ সামন্ত রচিত **'বৃক্ষপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পরিবেশকে নানা আঙ্গিক থেকে পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে—তাই এই কাজটিও আমার কাছে অপরিহার্য।

3.Materials: বর্তমান গবেষণাপত্রে পরিবেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুরদর্শিতার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টির উপর যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্যান্য সমালোচকের মন্তব্য ও মূল পাঠ্যগ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

4.Discussion:

পৃথিবীর আদিতে যে শক্তির পূজা হত তা মূলত প্রকৃতি। জীবকূলের উদ্ভবের পূর্বে থেকেই প্রকৃতি তার আপন ছন্দে বহমান। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম- এই পাঁচ উপাদানেই সমগ্র প্রানীকুলের সৃষ্টি ও লয়। এই প্রকৃতি সৃষ্টিতে মানুষের কোনো ভূমিকা না থাকলেও তার ক্ষতি করতে মানুষ সর্বদাই এগিয়ে আছে। বর্তমান যুগে জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বা পরিবেশ দূষণ তা একদিনের মানুষের কর্মফল নয়। যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর যে যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে এ তারই অমোঘ পরিনাম। তবে একসময় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সচেতন হয়েছে। আজ পরিবেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী

আন্দোলন ও নীতি নির্ধারণ হচ্ছে, তা হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এর পেছনে রয়েছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিগত দুই শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা বিজ্ঞানীদের হুঁশিয়ারি, দার্শনিকদের প্রকৃতিবাদী চিন্তা এবং কিছু যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম, যা মানুষের মনস্তত্ত্বকে আমূল বদলে দিয়েছিল। মানুষের লোভ কীভাবে প্রকৃতি পরিবেশকে বিপন্নতর করে তুলেছে প্রতিদিন, তার বিবরণ রয়ে গিয়েছে সাহিত্যের কাছে। তাঁরা নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বার্তা দিয়ে গেছেন প্রকৃতিকে রক্ষা করার। ভারতবর্ষের এমন একজন সাহিত্যিক যিনি তাঁর রচনায় মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য জুড়েই প্রেম, প্রকৃতি, পূজা মিলেমিশে গিয়েছে। তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে দিয়ে যেমন পরবর্তী পরিবেশ আন্দোলনের বীজকে ('বলাই') প্রোথিত করেছিলেন; পাশাপাশি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাও তিনি তাঁর নানা গল্পে (যেমন- সুভা, ছুটি, পোস্টমাস্টার) প্রকাশিত করেছিলেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ আন্দোলনের ভাবনা ও সাহিত্যে তার প্রভাব রয়েছে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা'র মতো বিখ্যাত নাটকেও।

শিল্পবিপ্লব, পরিবেশ আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ-এই তিনটি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন সময়ের এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মনে হলেও, এদের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক যোগসূত্র। সহজ কথায়, শিল্পবিপ্লব যদি প্রকৃতির ওপর মানুষের আগ্রাসনের 'সূত্রপাত' হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক দূরদর্শী 'সতর্কবার্তা', আর আধুনিক পরিবেশ আন্দোলন হলো সেই সতর্কবার্তারই 'ব্যবহারিক রূপ'। রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশভাবনা কিরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা কম-বেশী আমরা সবাই জানি। 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পরিবেশচেতনা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বলছেন,

"রবীন্দ্র সাহিত্যে সর্বত্র পরিবেশ বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রে দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার একটি হল বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যটি হল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্য। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে সান্নিধ্যই রবীন্দ্রনাথকে পরিবেশ আরও বেশি করে আকৃষ্ট করেছিল। কবিগুরুর শিলাইদহে বসবাসকালে জগদীশ চন্দ্র বোস বহুবার সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণা ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গবেষণা ভাবনার সাযুজ্যের জন্যই তাদের মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় হয়েছে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লিখছেন–

"প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল -কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষি বাক্যের সঙ্গে পরিচিত- 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিসৃতং' এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তার প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান। সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, একথা বিজ্ঞান এর প্রমাণ- ভান্ডারের মধ্যে জমা হয়নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নাই।"[২]

বিশ্বজগতের এই ঐক্যচেতনা রবীন্দ্রনাথের কবি সৃষ্টির কাছে ধরা দিয়েছিল।

'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে দিয়েও আমরা লক্ষ্য করি, প্রকৃতি বালক রবির কাছে কতটা আপন হয়ে গিয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। তাঁর জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃতির অনাবিল আনন্দ-

"কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" তখন "কর, খল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না-তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না-মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"[৩]

তাঁর শৈশবের মেঘদূত ছিল 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান" কবিতাটি। আমরা বুঝতে পারি চাকরমহলে মানুষ হওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি ছিল এক পরম আশ্রয়স্থল। শ্যামের কেটে দেওয়া গন্ডীর ভেতর সারাদিন বসে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে যেতেন বাইরের পৃথিবীটার দিকে চেয়ে-

"জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট-দক্ষিণধারে নারিকেল-শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানলার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত।... এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুলি তুলিয়া খায়, এবং চক্ষুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।"[৪]

এরপরেই পুকুরপারের নির্জনতা কবির কল্পনাবিলাসী মনকে একেবারে হরণ করে নিত। যে প্রকৃতিকে কবি ছেলেবেলা থেকেই ভালোবেসেছিল কালের প্রকোপে হয়তো মানুষের চক্রান্তে তা হারিয়ে গেছে, কেবল রয়ে গেছে সাহিত্যে তার স্মৃতি-

"পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম-

নিশিদিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,

ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট?

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে।"[৫]

রবীন্দ্র-জীবনচর্যায় পরকৃতি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তাঁর ছোটগল্প বা 'গল্পগুচ্ছ' কেবল মানবচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দলিল নয়, তা পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক গভীর জীবন্ত আলেখ্য। তাঁর গল্পগুলোতে প্রকৃতি কোনো জড় ব্যাকড্রপ বা নিষ্ক্রিয় পটভূমি নয়; বরং প্রকৃতি সেখানে একটি সজীব চরিত্র, কখনো মানুষের পরম সুহৃদ, আবার কখনো মানব সভ্যতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ। পৃথিবীর আদি প্রাণ বৃক্ষ। মানুষের সাথে গাছপালার সখ্যতা সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই। রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' (১৯২৮) গল্পটি এই বন্ধুত্বেরই এক চরম নিদর্শন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প-কারখানার ধোঁয়া ও বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে নাগরিকরা সোচ্চার হন। ১৮৫০-এর দশকে লন্ডনের টেমস নদীর ভয়াবহ দূষণ (Great Stink) এবং কয়লার ধোঁয়ায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর পর নাগরিক সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬৩ সালে ঐতিহাসিক আলকালাই অ্যাক্ট (Alkali Act) পাসের মাধ্যমে প্রথম আধুনিক পরিবেশ আইন চালু হয়। ১৮৬৪ সালে জর্জ পারকিন্স মার্শ তাঁর বিখ্যাত 'ম্যান অ্যান্ড নেচার' (Man and Nature) বইটি প্রকাশ করেন, যা আমেরিকার পরিবেশ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। এই ঘটনার প্রায় ১৩৩ বছর আগে ১৭৩০ সালে ভারতবর্ষে সংঘটিত হয়েছিল বিষ্ণোই আন্দোলন। ১৭৩০-এর দশকে যোধপুরের রাজা অভয় সিং তাঁর নতুন প্রাসাদ নির্মাণের সময় খেজারলি গ্রামের গাছগুলো কাঠের জন্য কেটে ফেলার জন্য সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। খেজারলি ও অন্যান্য গ্রাম থেকে বিষ্ণোইরা এই আন্দোলনে যোগ দিতে আসেন এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে কেটে ফেলা গাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য একে একে খেজরি গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অমৃতা দেবী সৈন্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং গাছ আঁকড়ে ধরে তাদের জীবন রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁর তিন মেয়ে আসু, রত্নি ও ভাগুও তাঁদের মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই আন্দোলনে রাজস্থানের খেজারলি গ্রামে খেজরি গাছ রক্ষার জন্য ৩৬৩ জন বিষ্ণোই প্রাণ উৎসর্গ করেন। এই ঘটনার প্রায় ২৪৩ বছর পর ১৯৭৩ সালে ভারতের উত্তরাঞ্চলের গাড়োয়াল হিমালয় অঞ্চলে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে চিপকো আন্দোলন শুরু হয়। গাছ কাটা রোধ করতে স্থানীয় মানুষ এখানেও গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রতিবাদ করেছিল। ক্রমে সময় যত এগিয়েছে এই আন্দোলন নানা রূপে আমাদের সামনে প্রকটিত হয়েছে। এই সব পরিবেশবাদী আন্দোলন শুরু হওয়ার অনেক আগেই চিন্তাশীল মানুষেরা ভেবেছেন মানুষ ও প্রকৃতি-পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানে 'ডিপ ইকোলজি' বা গভীর বাস্তুসংস্থানতত্ত্বের মূল কথা হলো-মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়, বরং প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান (তা সে একটি ক্ষুদ্র ঘাসই হোক বা বিশাল বৃক্ষ) মানুষের মতোই সমঅধিকার নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' (১৯২৮) গল্পটি এই তত্ত্বের এক অনবদ্য সাহিত্যিক রূপ। গল্পে বলাই নামের মাতৃহীন বালকটির গাছপালার প্রতি ভালোবাসা কোনো সাধারণ শখ নয়, তা ছিল গভীর একাত্মতাবোধ। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় তার মনে হতো সে যেন ঘাসের বুকের স্পন্দন টের পাচ্ছে-

"অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে পড়ে পড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'তার পরে? তার পরে? তার পরে?' তারা ওর চির-অসমাপ্ত গল্প। সদ্য গজিয়ে-ওঠা কচি কচি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন করে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাঁকু করে। হয়তো বলে, 'তোমার নাম কী'। হয়তো বলে, 'তোমার মা কোথায় গেল।' বলাই মনে মনে উত্তর করে, 'আমার মা তো নেই।'"[৬]

মাতৃহীন ছেলেটা যেন প্রকৃতির মধ্যেই নিজের সুখদুঃখ, আনন্দ খুঁজতে চেষ্টা করে-

"ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে-চড়ে বেড়ানো নয়। পূর্বদিকের আকাশে কালো মেঘ স্তরে স্তরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্তগা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর পড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী একটা সংগ্রহ করে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওর

অন্তর-প্রকৃতিটা চার দিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা বসে বসে আপন মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শুনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে একজোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ওই ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আস্তরণটা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ওই ঘাসের পুঞ্জ একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে; প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত- সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত- গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত।"[৭]

একসময় বলাইয়ের প্রাণাধিকপ্রিয় পথের মাঝে গজিয়ে ওঠা একটি শিমুল গাছকে তার কাকা যখন 'অপ্রয়োজনীয়' এবং 'রাস্তার সৌন্দর্য নষ্টকারী' বলে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন, তখন তা আধুনিক পুঁজিবাদী ও নগরকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এক সময় কেটেও দেন সেই গাছটিকে-

"কোনো এক সময়ে দেখলুম, লক্ষ্মীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে- এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, 'কাকি আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।"[৮]

চিরকালের মতো বলাই হারাল তাঁর পরম বন্ধুকে। গাছটি কেটে ফেলার পর বলাইয়ের যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা এবং তার কাকিমার যে শূন্যতাবোধ, তা আসলে প্রকৃতি ধ্বংসের পর মানবজাতির অবধারিত বিপন্নতারই পূর্বাভাস। আজকের চিপকো আন্দোলন বা গাছ বাঁচানোর লড়াইয়ের যে মূল সুর-"গাছেরও প্রাণ আছে এবং তাকে রক্ষা করা মানুষের দায়িত্ব"-তার বীজ নিহিত ছিল 'বলাই' গল্পে।

ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে যে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা মানুষকে কংক্রিটের খাঁচায় বন্দি করে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একাধিক গল্পে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ ও যান্ত্রিকতার সমালোচনা করেছেন। তেমনই একটি গল্প 'ছুটি'। ফটিক যখন তার চিলতে-পড়া নদীর ধার, প্রজাপতি ওড়ানো গাঁয়ের মাঠ ছেড়ে কলকাতার ইঁট-কাঠ-পাথরের শহরে মামাবাড়িতে বন্দি হলো, তখন সে আক্ষরিক অর্থেই শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করে।

"ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্য ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা- কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন- সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

কলকাতার যান্ত্রিক পরিবেশ ফটিকের মতো এক মুক্ত স্বভাবের গ্রামীণ শিশুকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এটি পরিবেশগত সংকটের কারণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যুর একটি বড় উদাহরণ।"[৯]

কলকাতার যান্ত্রিক পরিবেশ ফটিকের মতো এক মুক্ত স্বভাবের গ্রামীণ শিশুকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। মৃত্যুর দিকে ক্রমে এগিয়ে যাওয়ার সময়েও ফটিকের চেতনায় থেকে যায় প্রকৃতি-

"ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'ফটিক! সোনা! মানিক আমার!'

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে!'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'"[১০]

এই গল্পটি পরিবেশগত সংকটের কারণে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যুর একটি বড় উদাহরণ।

আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো 'ইকোফেমিনিজম', যা মনে করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে নারীকে অবদমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, ঠিক একইভাবে সে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার ও শোষণ করতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে নারী ও প্রকৃতির এই সমান্তরাল অবস্থান চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে 'সুভা' গল্পে। বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ে সুভার মানুষের সমাজে কোনো ভাষা ছিল না, কিন্তু প্রকৃতির সাথে তার ছিল গভীর মিতালী-

"প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা- বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত- একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।"[১১]

প্রকৃতির ঝিল্লিরব, নদীর কলতান, পাখির ডাক যেন সুভারই না-বলা ভাষার বিস্তৃতি ছিল। আর ছিল কয়েকটি মূক বন্ধু। তারাও যেন বুঝতো সুভার সব কথা।

"সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত- তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত- তাহার সহিষ্ণুতা পরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।"[১২]

সমাজ যখন এই সুভাকে তার চেনা পরিবেশ থেকে উপড়ে নিয়ে কলকাতার বাজারে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন করল, তা যেন প্রকৃতির বুক থেকে একটি লতা ছিঁড়ে ফেলার মতোই নিষ্ঠুর হয়ে বিঁধল পাঠকের বুকে।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ সম্পদ মানুষ করায়ত্ত করতে শুরু করেন। মাটির নিচ থেকে কয়লা ও লোহা তুলে প্রকৃতির বুক খালি করা। এ প্রসঙ্গে আমাদের নিশ্চিতভাবেই 'রক্তকরবী'র কথা মনে পড়বে। রক্তকরবীর মূল ভাবকে কেন্দ্র করে একবিংশ শতকে শুরুতে ভারতের ওড়িশা রাজ্যের নিয়মগিরি অঞ্চলে বসবাসকারী ডোংরিয়া কন্ধ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য আদিবাসীদের জমি, বন ও সাংস্কৃতিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কথা আমাদের মনে পড়ে। নিয়মগিরি পাহাড় ডোংরিয়া কন্ধ আদিবাসীদের কাছে পবিত্র স্থান। এই পাহাড়ে প্রচুর বক্সাইট (অ্যালুমিনিয়ামের কাঁচামাল) মজুত রয়েছে। খনিজ উত্তোলনের জন্য Vedanta Resources ও তার সহযোগী সংস্থাকে খনি স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আদিবাসীরা আশঙ্কা করেন যে খনি প্রকল্পের ফলে বনভূমি ধ্বংস হবে, পরিবেশের ক্ষতি হবে এবং তাদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। সরকারের করাল মুষ্টি থেকে সেই সম্পদ বাঁচাতেই শুরু হয়েছিল নিয়মগিরি আন্দোলন। একই রকমভাবে 'রক্তকরবী' নাটকটিতে মানুষের অপরিসীম লোভ আর পুঁজিবাদের চরিত্র প্রতীকীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কতটা অমানবিক দুর্বল হয়, 'রক্তকরবী'র মকররাজ, তার উদাহরণ। রক্তকরবীতে মকররাজ তার যক্ষপুরীর কারাগারে মাটির তল খুঁড়ে একদল ক্রীতদাস দিয়ে সোনা আহরণে মগ্ন। রাজার নাগপাশে বন্দি একদল মানুষ। অদৃশ্য রাজার লোভের আগুনে পুড়ে মরছে তার নিযুক্ত সোনার খনি

শ্রমিকরা। পুঁজিবাদের কালো থাবা যেভাবে খনি খুঁড়ে, শিল্পায়ন আর নগরায়ণের নামে প্রকৃতিকে বিদীর্ণ করছে, আজকের যুগেও সেই চিত্রটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটছে, তখন পশ্চিমা বিশ্ব একে দেখছিল 'মানবজাতির চরম উন্নতি' হিসেবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই যান্ত্রিক সভ্যতার ভেতরের কঙ্কালটি দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিল্পবিপ্লব মানুষের 'প্রয়োজন' মেটানো বন্ধ করে 'লোভ'কে উস্কে দিয়েছে। তিনি তাঁর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি' বা 'রাশিয়ার চিঠি'-তে বারবার লিখেছেন কীভাবে কারখানার কালো ধোঁয়া আর যান্ত্রিক কোলাহল মানুষের ভেতরের সহজ, সরল আত্মিক সত্তাটিকে মেরে ফেলছে। 'মুক্তধারা'তেও রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন কেমন করে মানুষের ক্ষতি করতে যন্ত্রসভ্যতা আগ্রাসী মূর্তি ধারন করেছে। ঈশ্বরের মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে গিয়েছে মুক্তধারা বাঁধ যন্ত্রের বিকট মাথা। এই বাঁধ বেঁধে মানুষকে জব্দ করার পন্থাটা আমাদের খুব চেনা। ১৯৮৫ সালে নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবরসহ একাধিক বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবাদে সালে এই নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে তথা রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা পর্বে এভাবেই প্রকৃতির কথা মিলেমিশে রয়েছে। ১৯১৪ সালে জাপান সফরে যাওয়ার সময় সাগরে জাহাজের থেকে তেল চুঁইয়ে পড়তে দেখে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ বিষয়ে ধাক্কা খান। বিষয়টি নিয়ে আধুনিক মানুষের উদাসীন মনোভাব প্রকৃতিপ্রেমী রবিকে আরও উদ্বিগ্ন করে তোলে। ফলে এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে পরিবেশ সচেতনতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

বৃক্ষ ও অরণ্য সম্বন্ধে সনাতন ভারতবর্ষের মনোভাব রবীন্দ্রনাথ পত্রে প্রবন্ধে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতীতে বৃক্ষপুজা, বৃক্ষপ্রীতি, অরণ্য-আকর্ষণ, তপোবন রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঋষি, কবি ও জন-সাধারণ প্রয়োজনের থেকে সৌন্দর্য ও পরিবেশ কল্যাণ বোধকেই অধিকরূপে প্রকাশ করে-ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসরণকারী রবীন্দ্রনাথও বৃক্ষকে অরণ্যকে কল্যাণসহায়ক শান্তি-মূর্তিতে দেখেছেন। সৌন্দর্যপ্রেমিক কবি হিসাবে তিনি বৃক্ষ, তার পত্রসজ্জা, তার উজ্জত কিশলয়ের সৌন্দর্য, ঝরা পাতার হলুদ এবং তার পত্ররাজিকে ঘিরে আলোছায়ার চারু আলপনা দু'চোখ ভরে দেখেছিলেন। বনস্পতির মহিমা তাঁর চিত্ত জয় করতো। তিনি পৌত্তলিক নন, শাস্ত্রার্থে তিনি বৃক্ষপুজা করেন নি। কিন্তু পূজা তিনিও করেছেন। শান্তিনিকেতনের গৌরপ্রাঙ্গনে ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হল। আশ্রমবালিকারা পরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী মন্ত্রপাঠ করেন, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূতের উদ্দেশ্যে ও মাঙ্গলিক মিলিয়ে মোট ছয়টি কবিতা পাঠ করেন। সভাস্থলে পঞ্চভূত সেজেছিলেন কলাভবনের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বিশী (ক্ষিতি)। অপ- সুধীর খাস্তগীর (কলাভবনের ছাত্র), তেজ- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মরুৎ- মনোমোহন দে (কর্মবিভাগ), ব্যোম- অনাথনাথ বসু (পাঠভবনের শিক্ষক)। বৃক্ষবাহক হয়েছিলেন আরিয়াম ও বিনায়ক মাসোজি। বাল্যকাল থেকে যে তপোবনের আদর্শ তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল তার বাস্তবায়িত রূপ শান্তিনিকেতন। এক-মাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ও জামাতাকে বিদেশ থেকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত করে এনেছিলেন। বৃক্ষরোপণ প্রচলন করেছিলেন। উদ্যান রচনার আগ্রহ, অরণ্যপ্রেম, বৃক্ষপ্রীতি এক অদ্ভুত ভাবনায় ভাবিত করেছিল, রানী চন্দের আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে আছে সেই স্মৃতি-**"আসছে বারে আমি ঠিক Forest Officer হয়ে জন্মাবো।"**[১৩] শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সামন্ত তাঁর 'বৃক্ষপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলছেন,

"শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য হল, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঋষিদের মতো অবস্থিত অরণ্যের মাঝখান থেকে তপোবনকে পেলেন না, রুক্ষ রিক্ত মরুপ্রায় অনুর্বর ভূমিখণ্ডে তপোবনকে গড়ে তুললেন। বাহ্যিক রূপেই শান্তিনিকেতন তপোবন হয়ে উঠলো না, অন্তরের দিক থেকেও তপোবনের আত্মা লাভ করলো। গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের ও অন্তরের সঙ্গে অন্তরতমের যোগ সাধনের ইঙ্গিতটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলছেন-"যো দেবোহগ্নৌ যোহ যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষ্ণু যো বনস্পতি তস্মৈ দেবায় মনোনমঃ । ব্রহ্ম ধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ।" তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন-"এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি-সেইজন্য এইখানে আমি সকল তীর্থের ফল লাভকরি।" উক্তিগুলি প্রমাণ করে যে শান্তিনিকেতনে তপোবনের ভাবসত্তাটিও জন্ম লাভ করেছিল।"[১৪] আজ বিশ্বজুড়ে যে 'Earth Day' বা পরিবেশ দিবস পালন করা হয়, রবীন্দ্রনাথ তার বহু আগেই ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনে 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' শুরু করেছিলেন। এটি কোনো লোকদেখানো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, এটি ছিল মাটির প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'(৩য় খন্দ)-তে বলেছেন,

"এই বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হইবার বাইশ বৎসর পর (জুলাই ১৯৫০) ভারতসরকার বনমহোৎসব আরম্ভ করেন। তখন বাংলাসরকার 'বনমহোৎসব' নামে যে পুস্তিকা প্রচার করেন, তাহাতে প্রচার-অধিকর্তা স্বীকার করিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথই দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছিলেন যে, এই সভ্যতা-বিধ্বংসী গৃধ্নতা, এই বনচ্ছেদ-নিবারণ করিতে না পারিলে দেশের সর্বনাশ। কবি বুঝিয়াছিলেন যে, "অবিলম্বে প্রতিরোধ করতে হবে এই ধূমাবতীর গতি। নতুন করে ব্রত নিতে হবে অরণ্যরচনার।" তাই তিনি প্রবর্তন করলেন 'বৃক্ষরোপণ'-উৎসব। কবির প্রবর্তিত এই উৎসব আজও শান্তিনিকেতনে সমস্ত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। ১৯৪২ হইতে কবির মহাপ্রয়াণের দিনে বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে উদ্যাপিত হইতেছে।"[১৫]

আজকের পরিবেশ আন্দোলন আর শুধু গাছ বাঁচানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের (Environmental Justice) কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ঠিক এই জায়গাগুলোতেই আধুনিক আন্দোলনের সাথে

মিলে যায়। শ্রীনিকেতনের কৃষিভাবনায় রবীন্দ্রনাথ রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। তিনি শ্রীনিকেতনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অথচ জৈব ভারসাম্য বজায় রেখে চাষাবাদের কথা বলেছিলেন, যা আজকের 'Organic Farming' বা পরিবেশ-বান্ধব কৃষির মূল কথা।

5.Conclusion: যে কোনো আন্দোলনের পেছনে থাকে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। বর্তমানে ইতিহাসের পাতায় যেসব বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিপ্লব ছবি আমরা দেখতে পাই, তা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হতে পারে। কিন্তু একটি সফল বা সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর এবং একদল চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের অক্লান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা। রবীন্দ্রনাথ শ্যামল ধরনীর কঙ্কালটা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই বারবার তাঁর নিজের কর্মের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান পরিবেশ সঙ্কটের এমন নানা ছবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়েই সাহিত্যের নানা ধারায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাই আমরা অনুভব করি পরবর্তী পরিবেশ আন্দোলনের চেতনা রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতোই বহমান।

REFERENCES:

১. মণ্ডল মহাদেব, ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পরিবেশচেতনা’, প্রতিভাস’ ওয়েবজিন

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খন্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, বিশ্বভারতী, পৃ-১২৫

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্ ৫৫. আপার চিৎপুর বোড, কলিকাতা, প্রকাশক-শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহ, নদীয়া, ১৩১৯, পৃ-৩

৪. তদেব, পৃ-৮-৯

৫. তদেব, পৃ-৯-১০

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পসমগ্র, প্রশান্তকুমার পাল, লালমাটি প্রকাশন, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রকাশকাল ২০২২, পৃ-৬৭২

৭. তদেব, পৃ-৬৭২

৮. তদেব, পৃ-৬৭৪

৯. তদেব, পৃ- ১৯০

১০. তদেব, পৃ- ১৯২

১১. তদেব, পৃ- ১৯৪

১২. তদেব, পৃ- ১৯৪

১৩. চন্দ রানী, ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,’ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ-২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৯, পৃ-৪১

১৪. সামন্ত রবীন্দ্রনাথ, ‘বৃক্ষপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ’, পাণ্ডুলিপি, ১২/৫ গোয়াবাগান স্ট্রীট, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ-১২

১৫. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, ‘রবীন্দ্রজীবনী’ ৩য় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, পৃ- ৩৫৪-৩৫৫।